ভারতীয় সংবিধানের অভিমুখে

সম্পাদনা
তুহিন কুমার দাস

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ.
অনার্স (সি.বি.সি.এস.) কোর্সের নতুন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত।

ভারতীয় সংবিধানের অভিমুখে

সম্পাদনা

তুহিন কুমার দাস

সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
যোগমায়া দেবী কলেজ, কলকাতা

ও

অতিথি অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

SPECIMEN COPY
NOT FOR SALE

২০১৯

বিজয়া পাবলিশিং হাউস

১০৬, বিবেকানন্দ রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

লেখক পরিচিতি

১) আর্তত্রান গোচ্ছাএত, সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শ্রীচৈতন্য কলেজ, হাবড়া।

২) বিমলেন্দু ঘোষ, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কাঁচরাপাড়া কলেজ, কাঁচরাপাড়া।

৩) ড. তারকনাথ জাতুয়া, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, টাকী গভর্নমেন্ট কলেজ, বসিরহাট।

৪) ড. আশীষ মিস্ত্রি, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল।

৫) ড. সঙ্গীত পাল, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, নব ব্যারাকপুর প্রফুল্লচন্দ্র মহাবিদ্যালয়, নিউ ব্যারাকপুর।

৬) ড. রুমকি বোস মজুমদার, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বাসন্তী দেবী কলেজ, কলকাতা।

৭) সুদেষ্ণা দাস, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ, দক্ষিণ বারাসাত।

৮) অর্ণব কয়াল, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেনস্, কলকাতা।

৯) কৌশিক সাউ, পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার ফকির চাঁদ কলেজ ও অতিথি অধ্যাপক পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত।

১০) তাপস পাল, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, আমডাঙা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়, বারাসাত।

১১) প্রভাস মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, নেতাজী নগর ডে কলেজ, কলকাতা।

১২) আবুল কালাম আজাদ, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ, কেশিয়াড়ী, পশ্চিম মেদিনীপুর ও অতিথি অধ্যাপক, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত।

১৩) সুমিতা দেবনাথ, পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, স্যার গুরুদাস মহাবিদ্যালয়, বিধাননগর।

১৪) গোবিন্দ নস্কর, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দমদম মতিঝিল কলেজ দমদম।

১৫) মানবেন্দ্র সাহা, পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সোনারপুর মহাবিদ্যালয়, সোনারপুর।

১৬) কিঙ্কর মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শান্তিপুর কলেজ, শান্তিপুর।

১৭) আলিউল হক্, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, চাকদহ কলেজ, নদীয়া।

১৮) মিঠুন ব্যানার্জ্জী, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর।

১৯) গৌতম কুমার নাড়ু, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লস, কলকাতা।

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

সংবিধান সংশোধন

— মিঠুন ব্যানার্জী

জগতের কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়; প্রকৃতির মত রাষ্ট্র ও সমাজ সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। বর্তমান যুগে বিশ্বের বেশির ভাগ রাষ্ট্রেই জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা তার নিজস্ব সংবিধান অনুসারে পরিচালিত হয়। সংবিধান হল একটি রাষ্ট্রের মৌলিক আইন। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সোপান হিসাবে পরিগণিত হওয়া এই সংবিধানও পরিবর্তনশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্র তথা সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার জন্যই সংবিধানকে যুগোপযোগী করে তুলতে সংবিধান প্রয়োজন হয়। বিগত ৬৮ বছরে ভারতবর্ষের সংবিধানের ১০১টি সংশোধন তারই প্রমাণ।

সংবিধানের বহুমাত্রিকতা :

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো দেশে সংবিধান পুস্তকাকারে সঙ্কলিত হয়েছে, কোনো কোনো দেশে বহু যুগ ধরে প্রচলিত প্রথা, রীতিনীতি, আইনসভা প্রণীত আইন ইত্যাদি সামগ্রিকভাবে সংবিধান রূপে বিবেচিত হয়। সংবিধান লিখিত বা অলিখিত যাই হোক তা নির্দিষ্ট যুগের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত বা সংগঠিত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের মত যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংবিধান সচরাচর লিখিত আকারেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। লিখিত সংবিধানের ক্ষেত্রে এই সময়ের প্রশ্নটি আরও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। বিশেষ এক কালপর্বে কিছু জ্ঞানী, আইনজ্ঞ, সমাজ-সচেতন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা করে এই সংবিধান রচনা করলেও এবং তারা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও কোনো মানুষের পক্ষেই ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা হওয়া সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে কোনো একটি দেশের মানুষের চাহিদা কেমন হবে তার সঠিক পূর্বানুমান তাদের পক্ষেও করা সম্ভব হয় না। এই পরিস্থিতিতে সংবিধান অপরিবর্তনশীলতার শিকলে বাঁধা থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা যেমন গ্রহণযোগ্যতা হারায়, তেমনই রাষ্ট্রীয় জীবন অচলাবস্থা দেখা দেয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্যই প্রয়োজন হয় সংবিধান সংশোধনের।

সংবিধানের স্থায়িত্ব, আকার-আকৃতি, পরিবর্তনশীলতার ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ করা যায়, তাই সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতির জটিলতার মাত্রার ভিত্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবিধানগুলিকে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পপরিবর্তনীয় এই দুই ভাগে ভাগ করে থাকেন সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ। এ.ভি.ডাইসি সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে বুঝিয়েছিলেন-

"One under which every law of every description can legally by changed with the same ease and in the same manner by one and the same body." অন্যদিকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান হল "One under which certain laws generally known as constitutional or fundamental laws, can not be changed in the same manner as ordinary law."[2] সাধারণত দেখা যায় যে লিখিত সংবিধানগুলি তুলনামূলক ভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় ও অলিখিত সংবিধানগুলি সুপরিবর্তনীয় হয়।

সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির বিভিন্নতা : বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা হয়ে থাকে তার বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে যেমন আড়ম্বরহীন বা প্রত্যক্ষ করা যায় না এমন পদ্ধতি রয়েছে তেমনই সংবিধান সংশোধনের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে সংবিধান সংশোধন এর এক প্রক্রিয়া চলে। লিখিত সংবিধানের মূল পাঠ্য বিষয়ে ব্যবহৃত শব্দের কোনো রকম পরিবর্তন না করেই সংবিধানের পাঠ্য বিষয় বা কোনো শব্দের প্রচলিত অর্থকে সম্প্রসারিত করে সংবিধানকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি তথা যুগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার জন্য এই আনুষ্ঠানিকতাহীন সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন উপায়ে এই ধরনের সংবিধান সংশোধন করা হয় যেমন, বিচার-বিভাগীয় ব্যাখ্যার দ্বারা সংবিধানের কোনো শব্দার্থের সম্প্রসারণ ঘটানো হয়; সাধারণত যে সমস্ত দেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় সেখানে বিচারবিভাগকে এই ধরনের অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়ে থাকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত শিল্পোন্নত দেশের সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সে দেশের বিচার বিভাগ অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। ভারতবর্ষেও সুপ্রিম কোর্টকে এই ধরনের ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। আনুষ্ঠানিকতাহীন আরেকটি উপায়ে সংবিধান সংশোধন হয়ে থাকে সেই সমস্ত দেশে যেখানে সংবিধান সুপরিবর্তনীয়। ব্রিটেনের সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক রীতিনীতির ব্যবহার করা হয়। সাংবিধানিক রীতি-নীতিগুলি সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করলেও সেগুলি সংবিধানকে পরিমার্জিত ও প্রভাবিত করতে পারে। এই রীতি-নীতিগুলি সংবিধানের কোনো কোনো ধারাকে অকার্যকর করে দিতে পারে; আবার সংবিধানের কোনো ধারাতে শব্দগত কোনো পরিবর্তন না এনেও সাংবিধানিক রীতি-নীতির সহায়তায় ধারাটিকে নতুন অর্থ দেওয়া যায়। ব্রিটেনের মত দেশের অলিখিত সংবিধানই শুধু নয়, ভারতের মত দেশের লিখিত সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রেও সাংবিধানিক রীতি-নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আনুষ্ঠানিকতাহীন তৃতীয় যে পদ্ধতি সংবিধান সংশোধন করার জন্য ব্যবহার করা হয় তা আইনবিভাগীয় পদ্ধতি; আইন প্রণয়ন করে সংবিধানের কোনো বক্তব্যকে পরিপূর্ণ করে তোলার উদ্দেশ্যে অনেক সময় 'শূন্যস্থান পূরণ' করার পথে সংবিধান সংশোধন করা হয়। আবার কখনো কখনো আইন প্রণয়ন করার মাধ্যমে সংবিধানের কোনো ধারার সাথে কোনো নতুন অর্থ সংযোজন করা হয়, ঐ ধারার বক্তব্যকে স্পষ্টতর করে তোলার জন্য।

সংবিধান সংশোধনের এই আনুষ্ঠানিকতা বর্জিত পদ্ধতিগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও এগুলি অত্যন্ত ধীর গতিসম্পন্ন, জনগণ এই প্রক্রিয়ার সাথে কোনভাবেই সক্রিয় হতে পারে না; সর্বোপরি এই পদ্ধতিগুলি কখনও সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয় না, তাই এই পদ্ধতিগুলির পরিবর্ত রূপে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশই তাদের সংবিধান সংশোধনের অনুষ্ঠানিক পদ্ধতি নির্দিষ্ট আকারে লিপিবদ্ধ করে এবং তার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নেয়। এই আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে সংবিধানের ধারাসমূহের মধ্যে শব্দগত পরিবর্তন আনা হয় এমনকি সংবিধানের কোনো নির্দিষ্ট ধারা-উপধারাকে বাতিল করে তার স্থানে অন্য ধারা বা উপধারা সংযুক্ত করা হয়।

ভারতবর্ষের সংবিধান ও তার সংশোধন পদ্ধতি : ভারতবর্ষের সংবিধানকে সংশোধন প্রক্রিয়ার নিরিখে সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার সমন্বয়ের এক অপূর্ব উদাহরণ বলা হয়। এই সংবিধানের কিছু অংশ অত্যন্ত নমনীয়, কিছু অংশ অনমনীয়, ও কিছু অংশ অত্যন্ত অনমনীয়। ভারতের গণপরিষদের সদস্যগণ নমনীয়তা ও অনমনীয়তার সঠিক সমন্বয় সাধনের বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাঁরা সাবেকি 'যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার তত্ত্ব' যেমন গ্রহণ করেননি তেমনিই ব্রিটেনের মত পার্লামেন্টের হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করার পক্ষেও তারা ঐক্যমতা প্রকাশ করেননি। বরং তারা 'মৌলিক আইনের তত্ত্ব' (Theory of fundamental law) ও 'পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব' (Theory of Parliamentary sovereignty) এর মধ্যে সমন্বয় সাধনের পক্ষে ছিলেন। তাই তারা ভারতীয় সংসদের হাতে সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা প্রদান করলেও তার নির্দিষ্ট লিখিত পদ্ধতি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সংবিধান সভার সদস্যদের মধ্যে ডঃ পি. এস. দেশমুখ, শ্রী ব্রজেশ্বর প্রসাদ প্রমুখ নমনীয় সংবিধানের পক্ষে মতপ্রকাশ করেন; অন্যদিকে এইচ. ভি. কমাথ প্রমুখ অনমনীয় সংবিধানের পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। এই আলোচনায় প্রত্যুত্তরে ডঃ বি. আর. আম্বেদকর ১৯৪৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর বলেন- "The Draft constituiton has eleminated the elaborate and difficult references such as dicision by a convention or a referendum.... It is only amendment of specific matters and they are only few that the ratification of the state legislature is required. All other Articles of the constitution are left to be amended by Parliament. The only limitation is that it shall be done by a majority of not less than two-thirds of the members of each House present and voting and majority of the total membership of each house."[3] সংবিধান সভার এই মতামত ভারতের সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

সংবিধানের বিশতম অধ্যায়ের ৩৬৮ নং ধারার মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা ভারতের সংসদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে এবং তার মাধ্যমে সংসদের আইন সংক্রান্ত দায়দায়িত্ব থেকে পৃথক এক সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসাবে সংসদের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংসদ আইন প্রণয়নের থেকে পৃথক পদ্ধতি অনুসরণ করে এই সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে। সংসদের এই বিশেষ দায়িত্বটির স্বীকৃতি স্বরূপ কতগুলি বিষয়ের উল্লেখ করা যায় যেমন- (১) একমাত্র সংসদের দুটি কক্ষের কোনো একটিতে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপন করা যায়। (২) সংসদের উভয় কক্ষ ও ক্ষেত্রবিশেষ রাজ্য আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত সংবিধান সংশোধন বিলে রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দিতে বাধ্য থাকেন। (৩) সংসদ সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে সাবিধানের যে কোনো অংশ সংশোধন করতে পারে; সে বিষয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যায় না।

তবে সংসদের সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত ক্ষমতা শুধুমাত্র ৩৬৮ নং ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; সংবিধানের নমনীয় অংশের সংশোধন সংসদ করতে পারে সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতি অনুসরণ করে। ভারতের সংবিধান সংশোধনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তবে তা প্রয়োজন বলেই মনে করেন সংবিধান বিশেষজ্ঞ কে.সি হোয়ার, তার মতে সংশোধন প্রক্রিয়ার বৈচিত্র্য না থাকলে তা সংশোধন প্রক্রিয়ায় অপ্রয়োজনীয় সীমাবদ্ধতা নিয়ে আসে।[৪]

ভারতের সংবিধানের নমনীয় অংশের সংশোধন : সংসদ সাধারণ আইন করার সময় যেমন সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; সেভাবেই কতগুলি সাবিধান সংশোধনের সিদ্ধান্ত সংসদের সদস্যদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নিয়ে থাকে সংসদ। এই সরল পদ্ধতিতে যে সমস্ত সাংবিধানিক বন্দোবস্তগুলির পরিবর্তন সাধন করা যায়, সেগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। (১) কিছু বিষয় আছে যেগুলির ক্ষেত্রে সংসদ সাবিধানের কোনো ধারার ভিত্তিতে রচিত কোনো আইনের পরিবর্তন সাধন করলেও সংবিধানের ঐ ধারাটিকে অপরিবর্তিত রেখে দেয়; ধারাটিতে ব্যবহৃত শব্দসমূহে কোনো রকম পরিবর্তন ঘটানো হয় না, যেমন সংবিধানের ১১নং ধারা অনুসারে সংসদ নাগরিকতা সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করতে পারে। এই ক্ষমতাবলে সংসদ আইন প্রণয়ন করলে নাগরিকতা সম্পর্কিত প্রচলিত আইন পরিবর্তন আসলেও; নাগরিকতা সম্পর্কিত ৫-১০ নং ধারা অপরিবর্তিত থাকে।[৫] (২) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের এই পদ্ধতিতে সংসদ কতগুলি বিষয়ের ক্ষেত্রে সংবিধানের নির্দিষ্ট ধারায় ব্যবহৃত শব্দগুলির পরিবর্তন সাধনও ঘটাতে পারে। এইরকম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল:

(ক) নতুন অঙ্গরাজ্যের গঠন বা অঙ্গরাজ্যের পুনর্গঠন (ধারা- ২,৩,৪)।
(খ) রাজ্য আইন সভার দ্বিতীয় কক্ষ গঠন বা অবলুপ্তি (ধারা - ১৬৯)।

(গ) সংবিধানের প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তপশিলের সংশোধন।
(ঘ) সংসদের কোরাম সংক্রান্ত বিষয় [ধারা - ১০০(৩)]
(ঙ) সংসদের বিশেষ সুবিধা সংক্রান্ত বিষয় (ধারা - ১০৫)।
(চ) সংসদদের বেতন ভাতা সংক্রান্ত বিষয় (ধারা - ১০৬)।
(ছ) সংসদের উভয় কক্ষের কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয় (ধারা - ১১৮/২)।
(জ) সুপ্রিম কোর্টের বিচারক সংখ্যা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয় (ধারা - ১২৪)।
(ঝ) সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ার সম্প্রসারণ (ধারা - ১৩৫)।
(ঞ) সরকারি ভাষা ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয় (ধারা - ৩৪৮)।
(ট) দেশের নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় (ধারা - ৩২৭)।
(ঠ) নির্বাচন ক্ষেত্রের পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত বিষয় (ধারা - ৮১)।
(ড) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মন্ত্রিসভা সংক্রান্ত বিষয় (ধারা - ২৪০)।

এই সমস্ত বিষয়ে সংবিধান সংশোধন বিলের বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতির মতই সংসদের যৌথ অধিবেশনে আহ্বান করা হয়। তবে বিলটি সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিল হওয়ার জন্য, রাষ্ট্রপতি সংসদের দুই কক্ষে পাশ হওয়া বিলে সম্মতি জানাতে বাধ্য থাকেন।

৩৮৬ নং ধারা[৬] : সংবিধানের ধারার ১নং উপধারাতে বলা হয়েছে যে, সংসদ তার সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে ভারতের সংবিধানে যা কিছু আছে তার সাথে সংযোজন, তার পরিবর্তন বা নিরসনের আকারে এই সংবিধানের যে কোনো বিধান, এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসারে সংশোধন করতে পারে।

ভারতের সংবিধানের অনমনীয় অংশের সংশোধন : সংবিধানের ৩৬৮ নং ধারার ২নং উপধারার দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে বলা হয়েছে যে, সংসদের যে কোনো কক্ষে সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিল উত্থাপন করার পর তার প্রতি কক্ষে তা বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে পাশ করাতে হয়। বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলতে এখানে বোঝান হয়েছে হয় যে প্রতি কক্ষের মোট সদস্য[৭] সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা বিলটি সমর্থিত হতে হবে। লোকসভার অনুশাসন অনুসারে সংবিধান সংশোধন বিল পাশ করার প্রতিটি পর্যায়ে বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। এই স্তরগুলি হল (১) সংবিধান সংশোধন বিল উত্থাপন, (২) বিলটি সিলেক্ট কমিটি বা যুগ্ম কমিটির কাছে পাঠান, (৩) বিলটি বিষয়ে জনমত সংগ্রহের জন্য তা প্রচার করার বিষয়, (৪) বিলটির উপধারা ও তালিকার বিষয়ে ভোটগ্রহণ, (৫) সংশোধন সম্পর্কে ভোট গ্রহণ এবং (৬) বিলটির পাশ করানো, সবক্ষেত্রেই বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন হয়। তারপর বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে গেলে তার সম্মতির মাধ্যমে বিলটি আইনে পরিণত হয়। ভারতের সংবিধানের অধিকাংশ সংশোধন ৩৬৮/২ নং ধারার এই প্রথম অংশটি অনুসরণ করে করা হয়ে থাকে।[৮]

ভারতের সংবিধানের অতি অনমনীয় অংশের সংশোধন : ৩৬৮/২নং ধারার দ্বিতীয় অংশে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সংবিধানের-

(ক) ৫৪, ৫৫ নং ধারাতে উল্লিখিত বিষয় অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়, ৭৩,১৬২ নং ধারাতে উল্লিখিত কেন্দ্র ও রাজ্যের নির্দিষ্ট ক্ষমতা-সীমা সংক্রান্ত বিষয় এবং ২৪১ নং ধারাতে উল্লিখিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের হাইকোর্টের গঠন ক্ষমতা, কার্যাবলি সংক্রান্ত বিষয় বা

(খ) সংবিধানের ৫নং অংশের ৪র্থ অধ্যায় যেখানে সুপ্রিম কোর্ট সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম লিপিবদ্ধ রয়েছে, ৬নং অংশের ৫ম অধ্যায় যেখানে রাজ্য হাইকোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সংক্রান্ত বিষয় লিপিবদ্ধ রয়েছে, ১১নং অংশের ১ম অধ্যায় যেখানে আইনবিভাগীয় ক্ষমতার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক নির্ধারণের বিষয়টি লিপিবদ্ধ আছে বা

(গ) সপ্তম তপশিলের কোনো বিষয় যেখানে কেন্দ্র, রাজ্য ও যৌথ তালিকা লিপিবদ্ধ রয়েছে বা

(ঘ) সংসদে রাজ্যসমূহ থেকে প্রতিনিধিত্ব বা

(ঙ) ৩৬৮নং ধারাটির কোনো রকম সংশোধন করতে হলে:

৩৬৮/২ ধারার প্রথম অংশে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সংসদের উভয় কক্ষে সংবিধান সংশোধন বিল পাশ হওয়ার পর বিলটি ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির ন্যূনতম অর্ধেক সংখ্যক আইনসভার দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়। রাজ্য আইনসভাগুলি বিলটিকে সমর্থন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে তবে ঐ বিলে কোনো রকম পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। অবশিষ্ট রাজ্য আইনসভাগুলির মতামত এক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয় এবং এরপর বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হলে, তিনি অনুমোদন দিতে বাধ্য থাকেন, এক্ষেত্রে তিনি ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না; রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভের পর বিলটি আইনে পরিণত হয়।

৩৬৮/২ নং ধারা অনুসারে সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের উভয় কক্ষের ঐকমত্য প্রয়োজন হয়। সংসদের দুই কক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে সেক্ষেত্রে সাধারণ বিল পাসের পদ্ধতি অনুসরণ করে সংসদের যৌথ অধিবেশন আহ্বান করা যায় না; বিলটি বাতিল হয়ে যায়। যেমন ১৯৭০ সালে রাজন্য ভাতা বিল রাজ্যসভার দ্বারা অনুমোদিত না হওয়ার জন্য বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ৩৬৮/২ নং ধারার মাধ্যমে এভাবে ভারতের সংবিধান সংশোধনের যাবতীয় ক্ষমতা সংসদের হাতে অর্পণ করার পাশাপাশি ৩নং উপধারাতে বলা হয়েছে যে এই ধারার মাধ্যমে সংবিধানের ১৩নং ধারার কোনো কিছুই সংশোধন করা যাবে না।

সংসদের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতাকে ভারসাম্যাবস্থায় রাখার প্রয়াস: ভারতের সংবিধানে সংশোধন করার ক্ষেত্রে সংসদকে যে বিস্তৃত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাতে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এক্ষেত্রে ভারতের সংসদ ব্রিটেনের পার্লামেন্টের মতই সার্বভৌম। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যাওয়ার ফলে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে কেন্দ্রীয় সরকার নিজ স্বার্থের অনুকূলে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির পুনর্বিন্যাস করতে পারে। তবে ভারতের সংবিধানে যেভাবে সুপরিবর্তনীয়তা এবং দুষ্পরিবর্তনীয়তা সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে তার মাধ্যমেই সেই বিপদকে অন্তত স্বাভাবিক অবস্থায়, দূর করার বন্দোবস্ত সংবিধানেই রাখা হয়েছে। সংবিধানের নমনীয় অংশ যা সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে সংশোধন করা যায়, তার সাথে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ কোনভাবেই জড়িত নয়। সংবিধানের অনমনীয় অংশ যা সংশোধনের জন্য বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হয় তার সঙ্গেও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিকট সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই অনমনীয় অংশে থাকার জন্য রাজ্যগুলির পরোক্ষ ভূমিকা এই বিষয়গুলির ক্ষেত্রেও থাকা আবশ্যক, সেই কারণেই এই বিষয়গুলিতে সংবিধান সংশোধনের জন্য রাজ্যসভার হাতে লোকসভার মতই ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। দুই কক্ষের যৌথ অধিবেশনের ব্যবস্থাও রাখা হয়নি এই বিষয়গুলি নিয়ে দুই কক্ষের বিরোধ মীমাংসা করার জন্য। সংবিধানের অতি অনমনীয় অংশ, যা প্রত্যক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বার্থের সাথে জড়িত, তার সংশোধনের ক্ষেত্রে ভারতের ৫০% রাজ্যের আইনসভার দ্বারা সংবিধান সংশোধনী আইন অনুমোদিত হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এভাবে সংসদের হাতে সংবিধান সংশোধনের যাবতীয় ক্ষমতা অর্পণ করেও ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখার পর্যাপ্ত বন্দোবস্ত সংবিধানেই রাখা হয়েছে।

তবে বিগত ৬৮ বছরে ১০১টি সংশোধন (বিস্তারিত পরিশিষ্টে দেখুন) ভারতের সংবিধানে নিয়ে আসা সম্ভব হলেও এই প্রক্রিয়া সহজ-সরল পথে চলেছে এমন নয়। এই সময়কালে ভারতের সংবিধানিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যা দেখা যায় তা হল, ভারতের সংসদ একদিকে দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যেমন নিজের চরম সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সদাতৎপর থেকেছে, তেমনই ভারতের মত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংবিধানের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিচার বিভাগ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এসেছে। বিচার বিভাগ সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে সংসদকে সাংবিধানিক এক্তিয়ারের মধ্যে বেঁধে রাখার উদ্যোগ নিয়েছে।

সংসদ ও সুপ্রিম কোর্টের দ্বন্দ্ব: সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি ভারতের বিচার বিভাগ ও সংসদের চাপান-উতোর শুরু হয়েছে ১৯৫১ সাল থেকে। সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আইনটি মৌলিক অধিকার বিরোধী আইনকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, সেই কারণে এই সংশোধনীয় আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে ভারত

সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেন শঙ্করিপ্রসাদ।[৯] একই ভাবে ১৯৬৫ সালে রাজস্থান সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেন সজ্জন সিং।[১০] দুটি ক্ষেত্রেই সরকার নবম তফশিলের আইনকে সুরক্ষিত করতে সংবিধান সংশোধন করেছিল। এই দুটি ক্ষেত্রেই সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় সরকারের পক্ষে এবং জানায় যে, সংবিধানের ১৩ নং ধারা 'সংবিধান সংশোধনী আইনের' ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, শুধুমাত্র সংসদ প্রণীত সাধারণ আইনের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। বস্তুত ১৯৬৭ সালে গোলকনাথ মামলার[১১] আগে অবধি সংসদের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা অসীম বলেই বিবেচিত হত এবং সংবিধানের কোনো অংশই সংশোধনের অযোগ্য বা সংসদের এক্তিয়ার বহির্ভূত বলে গণ্য হত না।

গোলকনাথ মামলা ও সংসদের সংশোধনী ক্ষমতা: ১৯৬৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলায় মৌলিক অধিকার সমূহের সংশোধন-যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। ১১জন বিচারপতির মধ্যে ৬জন বিচারপতি পূর্ববর্তী দুটি মামলার রায়কে বাতিল করেন। প্রধান বিচারপতি সুব্বারাও বলেন যে ৩৬৮নং ধারাটিতে কেবলমাত্র সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির উল্লেখ আছে, এই ধারা সংসদকে সংবিধান সংশোধনের কোনো অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করেনি। প্রকৃত পক্ষে সংসদের এই ক্ষমতার উৎস হল ২৪৫ নং ধারা যা সংসদকে ও রাজ্য আইনসভাকে যথাক্রমে সমগ্র ভারতের জন্য ও সমগ্র রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে, ২৪৬ নং ধারা যেখানে সংসদ ও রাজ্য আইনসভার আইন প্রণয়ন যোগ্য বিষয়গুলির উল্লেখ আছে ও ২৪৮ নং ধারা যা সংসদকে রাজ্য-তালিকা ও যুগ্ম তালিকায় উল্লিখিত হয়নি এমন যে কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary power) প্রদান করেছে। তাই সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত যে ক্ষমতাবলে সংসদ মৌলিক অধিকার সংশোধন করতে চাইছে, তা সংসদের সাধারণ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থেকে পৃথক নয়। ফলে, সংবিধানের ১৩/২ নং ধারা অনুসারে তা বাতিল যোগ্য এবং তার সাহায্যে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারা সমূহ সংশোধন করা সম্ভব নয়, সংসদের সে ক্ষমতা নেই।

৩৬৮নং ধারায় সংশোধন: গোলকনাথ মামলার রায়কে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালে ২৪তম সংশোধনী আইন প্রণীত হয়। এই আইনের মাধ্যমে ৩৬৮নং ধারাতে কয়েকটি পরিবর্তন আনা হয়। প্রথমত, ধারাটির মূল বয়ানের 'সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি' এই প্রান্তটীকাটি বদল করে নতুন প্রান্তটীকা হিসাবে লেখা হয় 'সংসদের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা এবং সংশোধনের পদ্ধতি'। ফলে, সংসদের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতার উৎস হিসাবে ৩৬৮নং ধারাকে গণ্য করার কোনো বাধা আর থাকল না। এর পাশাপাশি ৩৬৮নং ধারাতে তিনটি উপধারা যোগ করা হয়। ৩৬৮/১ ধারাতে ঘোষণা করা হয় যে, সংসদ সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী, তাই সংবিধানের যে কোনো ধারার সংশোধনও সংসদ করতে পারে। ৩৬৮/২নং ধারাতে বলা হয় যে, সংবিধান সংশোধন বিল আইনসভায় পাশ হওয়ার পর তাতে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ করতে পারে।

৩৬৮/২নং ধারাতে বলা হয় যে, সংবিধান সংশোধন বিল আইনসভায় পাশ হওয়ার পর তাতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকবেন। ৩৬৮/৩ নং ধারাতে বলা হয় যে, ১৪ নং ধারার নিয়মটি সংবিধান সংশোধন আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এভাবে ৩৬৮ নং ধারা ব্যবহার করে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা ছিল তা যেমন দূর করা হল, তেমনই ১৩নং ধারা ব্যবহার করে সংসদের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা যাতে আদালত ভবিষ্যতে খর্ব করতে না পারে তাও নিশ্চিত করা হল।

২৫তম সংবিধান সংশোধন আইন: একই বছর সরকার আরও তিনটি সংবিধান সংশোধন করে[১২], তার মধ্যে ২৫তম সংবিধান সংশোধনটি এখানে প্রাসঙ্গিক। এই সংশোধনীটির মাধ্যমে সংসদ সংবিধানের ৩১নং ধারা সংশোধন করে ৩১-গ উপধারা যোগ করে ৩৯-খ ও ৩৯-গ উপধারার নির্দেশমূলক নীতি কার্যকর করার জন্য প্রণীত আইনকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে। ৩১-গ উপধারাতে বলা হয় যে, ৩৯-খ ও ৩৯-গ উপধারার নীতি রূপায়ণের জন্য রাজ্য আইনসভা কোনো আইন প্রণয়ন করলে কোনো আদালতে তার সমীক্ষা করা যাবে না। প্রথম ও চতুর্থ সংবিধান সংশোধন করার মাধ্যমে ভূমিসংস্কার করার যে উদ্যোগ শুরু হয়েছিল তা আরও সহজ করে তুলতেই এই সংশোধন করা হয়।

কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য মামলা: সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদের এই সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয় যখন ২৪ ও ২৫তম সংবিধান সংশোধনী আইনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কেশবানন্দ ভারতী[১৩] কেরালা রাজ্যের বিরুদ্ধে ১৯৭৩ সালে মামলা করেন। মুখ্য বিচারপতি সিক্রি ১৩ সদস্যের একটি সম্পূর্ণ বেঞ্চ গঠন করেন। তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতি এক ঐতিহাসিক রায় দেন। যদিও এই রায়ে গোলকনাথ[১৪] মামলার রায়টি বাতিল করা হয় এবং ১৩ জন বিচারপতির মধ্যে ১০জনই এই রায় দেন যে, ৩৬৮নং ধারাতেই সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত ক্ষমতার অস্তিত্ব রয়েছে; ১৩/২ নং ধারাতে যে আইন বা 'Law' এর উল্লেখ আছে তা কোনভাবেই সংবিধান 'সংশোধন আইন' নয়। তবে, ৩৬৮নং ধারা অনুসারে সংসদ অনিয়ন্ত্রিত সংশোধন ক্ষমতার অধিকারী কি না সে প্রশ্নে বিচারপতিগণ 'implied limitation[15]' বা 'নিহিত নিয়ন্ত্রণে'র কথা বলেন। বিচারপতিদের ৭:৬ সংখ্যাগরিষ্ঠতাতে সিদ্ধান্ত হয় যে, 'Art 368 does not enable Parliament to alter the "Basic Structure" or the framework of the constitution' অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট এ ক্ষেত্রে সংসদের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা স্বীকার করে নিলেও, মৌলিক অধিকার সহ সংবিধানের অন্যান্য সহ গুরুত্বপূর্ণ ধারা, উপধারা ও ব্যবস্থাপনাগুলিতে সংশোধন করার ক্ষেত্রে সংসদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দেয় যেগুলি সংবিধানের 'মৌলিক কাঠামো'[16] রূপে গণ্য হয়, তবে কেশবনন্দ ভারতী বনাম কেরল রাজ্য মামলায় রায়ে সংবিধানের 'মৌলিক কাঠামো' এর ধারণাটি স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করেনি সুপ্রিম কোর্ট। এছাড়াও এই

মামলার রায়ে সংবিধানের ৩১-গ উপধারা আংশিক ভাবে অবৈধ ঘোষণা করা হয়, বলাহয় যে, ৩১-গ ধারা অনুসারে রাজ্য বিধানসভাগুলি ৩৯-খ ও ৩৯-গ ধারার ভিত্তিতে কোনো নীতি রূপায়ণ করার জন্য আদালতের পর্যালোচনা থেকে সুরক্ষিত আইন প্রণয়নের যে ক্ষমতা ভোগ করত তা তারা আর ভোগ করতে পারবে না। বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা আদালত ভোগ করবে, আইন বিভাগীয় ঘোষণার মাধ্যমে তার অবসান ঘটানো যাবে না।

৪২তম সংবিধান সংশোধন: সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত ধারনার অস্পষ্টতাকে ব্যবহার করে সংসদ পুনরায় সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে তার সার্বভৌম, চরম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালে ভারতের ইতিহাসের সব থেকে বড় সংবিধান সংশোধন নিয়ে আসে। এর মাধ্যমে সংবিধানের ৩৬৮ নং ধারাতে ৪ ও ৫নং উপধারা যোগ করা হয় 'মৌলিক কাঠামো' সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা দূর করার উদ্দেশ্যে। ৩৬৮/৪ ধারাতে বলা হয় যে, ৩৬৮ নং ধারা অনুসারে যে সংবিধান সংশোধন করা হবে, সে বিষয়ে আদালতে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। এভাবে সংবিধান সংশোধন আইনকে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ৩৬৮/৫ ধারাতে সংসদের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতাকে সীমাহীন বলে ঘোষণা করা হয়।

মিনার্ভা মিলস মামলা: সংবিধানের সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপ্রিম কোর্ট পুনরায় সচেষ্ট হয় ১৯৮০ সালে মিনার্ভা মিল্‌স মামলার মাধ্যমে। এই মামলায় ৩৬৮/৪ ও ৩৬৮/৫ নং ধারার সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। বিচারপতি সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিদের রায় ঘোষণা করে ঐ দুটি ধারাকে অবৈধ বলে বাতিল করে দেন। এর মাধ্যমে পুনরায় ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সংসদকে সংবিধান সংশোধন করার অসীম ক্ষমতা দেওয়ার পরিবর্তে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলে। আদালতের যুক্তি ছিল এই যে, সংসদ এই বিষয়ে সীমাহীন ক্ষমতা পেলে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংশোধন করে কেশবানন্দভারতী মামলার রায়কে উপেক্ষা করবে। এই রায় দানের প্রসঙ্গে বিচারপতি পি. এন ভগবতী 'বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা' সংক্রান্ত আদালতের ক্ষমতাকে সংবিধানের 'মৌলিক কাঠামো'রঅংশ হিসাবে ঘোষণা করেন। আদালত একথাও বলে যে, আদালতকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হলে, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণের ঘটনা ঘটলে তার বিরুদ্ধে নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদান করা আদালতের পক্ষে সম্ভব হবে না।

সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার ধারণা: কেশবানন্দ ভারতী মামলার পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের কোনো সম্পূর্ণ বেঞ্চ ঐ মামলার রায় বাতিল না করায় আদালত যে কোনো সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করতে

পারে, যখন দেখে যে, সংবিধান সংশোধনটি কোনো ভাবে ভারতের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে প্রভাবিত করছে। ১৯৭৫ সালে বিচারপতি এ. এন. রায় এর নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের একটি সম্পূর্ণ বেঞ্চ গঠন করে কেশবানন্দ ভারতী মামলার রায় বাতিল করার প্রচেষ্টা সরকার করলেও, অজ্ঞাত কারণে সেই সম্পূর্ণ বেঞ্চ বিচারপতি ভেঙে দেন। ফলে, মিনার্ভা মিলস মামলার পরবর্তীকালে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার ধারণা একপ্রকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৮১ সালে, ওয়ামন রাও বনাম ভারত সরকার মামলার রায়ে সুপ্রিমকোর্ট স্পষ্টভাবে জানায় যে কেশবানন্দ ভারতী মামলার রায় কার্যকর হওয়ার দিন অর্থাৎ ২৪/৪/১৯৭৩ এর আগে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যে সমস্ত আইন নবম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল সেগুলি বৈধ হলেও এই তারিখের পরবর্তীকালে কোনো আইন নবম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা হলে এবং তা ভারতের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী হলে সেই আইন ও বাতিলযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ৩১-খ ধারার মাধ্যমে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় আইনকে সুরক্ষা প্রদানের যে ব্যবস্থা নবম তফসিলের মাধ্যমে করা হয়েছিল তা ক্রমশ সংবিধান সংশোধনের একটি হাতিয়ার হয়ে উঠছিল, তাই এই রায়ের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট সংসদের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। পরবর্তীকালে আই.আর. কোয়েলহো বনাম তামিলনাড়ু মামলার মাধ্যমে এই বিষয়টি আরো স্পষ্টতা লাভ করে। এই মামলায় ৯ বিচারপতির বেঞ্চের সকলে একমত হন এ বিষয়ে যে, সংসদের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং তারা একথা ঘোষণা করেন যে, ৩১-খ ও ৯ম তফসিলকে ব্যবহার করে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো বিরোধী আইন প্রণয়ন করা হলে তাকে আদালত অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারবে। বস্তুত এই মামলার রায়ে মিনার্ভা মিলস ও ওয়ামান রাও মামলার অস্পষ্টতাগুলি দূর করা হয় এবং বলা হয়, ভারতের সংবিধান সভা যা সংবিধান রচনা করেছিল তাও সংবিধান সভা কর্তৃক সৃষ্টি করা সংসদ এক নয়। তাই সংবিধান রচনা করা ও সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা এক হতে পারে না। সংবিধান রচনার ক্ষমতা, যা সংবিধান সভার হতে ছিল তা অসীম হলেও, সংবিধান থেকে লাভ করা সংসদের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা অসীম হতে পারে না। সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা কেশবানন্দ ভারতী মামলার পরবর্তী যুগে সংবিধানের মৌলিক কাঠমোর দ্বারা সীমাবদ্ধ।

ভারতের সংবিধান সংশোধনের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব: স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষের অগ্রগতির ক্ষেত্রে ভারতের সংবিধান যে পথপ্রদর্শকের গুরু দায়িত্ব পালন করেছে সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। এই গুরু দায়িত্ব যাতে সংবিধান যথাযথ ভাবে পালন করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য বিগত ৬৫ বছরে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে ১০০টি সংবিধান সংশোধন ইতি মধ্যেই করা হয়ে গেছে। এই সমস্ত সংবিধান সংশোধনগুলির কিছু কিছু যেমন

রাজনৈতিক দিক থেকে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে, তেমনই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আর্থ সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে।

সংবিধান সংশোধনের রাজনৈতিক প্রভাব: ভারতের সংবিধান সংশোধনের যে প্রক্রিয়া ১৯৫০ এর দশকে শুরু হয়েছিল তার মধ্যে প্রথম দিককার কতগুলি সংশোধন যেমন ২, ৭, ৯, ১২, ১৩, ১৮, ৩৫তম সংবিধান সংশোধনগুলি এক প্রকার রাজনৈতিক-আইনগত পরিবর্তন নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। এগুলির মাধ্যমে নতুন রাজ্য গঠন, রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে নতুন ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্তি, লোকসভাতে জনগণের প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে পরিবর্তন, কিছু ভূখণ্ড পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। এর পাশাপাশি ভারতের রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে এক নতুন দিশা দেওয়ার প্রয়াসও নেওয়া হয়েছিল সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে। এই উদ্দেশ্যে প্রথম পদক্ষেপ ছিল ১৯৫৪ সালের তৃতীয় সংবিধান সংশোধন, যার মাধ্যমে রাজ্য তালিকাভুক্ত কতগুলি বিষয়কে যুগ্ম তালিকাভুক্ত করা হয়। এই সংবিধান সংশোধনটি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা-কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট পদক্ষেপ ছিল। একইভাবে ১৯৭১ সালের ২৪তম সংবিধান সংশোধনটিও সংসদকে সরকারের অন্য দুই বিভাগের তুলনায় বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন করে তুলতে চেয়েছিল। পরবর্তী কালে ৪২তম ও ৪৪তম সংবিধান সংশোধন ও ভীষণভাবে ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল। ৪২তম সংশোধনটি সংবিধানের প্রস্তাবনাতে 'সমাজতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'সংহতি' শব্দগুলি জুড়ে দিয়ে ভারত রাষ্ট্রের অগ্রগতির অভিমুখ নির্ধারণ করে দিয়েছিল। নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে মৌলিক অধিকারের উপরে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক ভূমিকার আভাস দিয়েছিল। জরুরী অবস্থার মধ্যে এই সংবিধান সংশোধন নিয়ে আসা হয়েছিল; তার প্রভাবও লক্ষ্যণীয় এই সংবিধান সংশোধনীতে। তৎকালীন সরকারের তীব্র ক্ষমতা-তৃষ্ণা এই সংবিধান সংশোধনকে বিশেষ পরিচয় প্রদান করে। ভারতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করেছিল এই সংশোধন। কেন্দ্রীয় আইনের সংবিধানিক বৈধতা বিচার করার হাইকোর্টের ক্ষমতা হরণ করা হয় এই সংশোধনের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকারকে যে কোনো রাজ্যে কেন্দ্রের সশস্ত্র বাহিনী পাঠানোর অধিকার দেওয়া হয়। বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ৩২ক ধারার সংযোজনের মাধ্যমে রাজ্য আইনসভায় পাস হওয়া আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা-সীমাবদ্ধ করতে, সেই আইনের সাথে কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধের শর্ত চাপানো হয়। রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিসভার পরামর্শ মানতে বাধ্য করা হয়। এসবের মধ্যে দিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

জরুরী অবস্থার সময়ে সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার ফলস্বরূপ কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটে এবং জনতা পার্টির সরকার ক্ষমতায় এসে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের এ ব্যবস্থাপনাকেই বাতিল করে দেয়। রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিসভার পরামর্শ একবার পুনর্বিবেচনার জন্য ফিরত পাঠানোর স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এই সংশোধনের মাধ্যমে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। জরুরী অবস্থার সময়ও যাতে ২০ ও ২১ নং ধারার মৌলিক অধিকার ভোগ করা সম্ভব হয় তা নিশ্চিত করা হয়। জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়। বলা হয় যে ক্যাবিনেটের লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রপতির পক্ষে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা সম্ভব হবে। রাজ্য সরকারের অনুমতি ছাড়া রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানোর বিধান বাতিল করা হয়।

পরবর্তীকালে ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা দূর করার ক্ষেত্রে ও সংবিধান সংশোধনের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক দলের সদস্যদের নীতিবহির্ভূত ভাবে দলত্যাগ ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে দীর্ঘদিন কলুষিত করেছে। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে ৫২তম সংবিধান সংশোধন এর মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা করা হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভার হাতে দলত্যাগকারী সাংসদ ও বিধায়কদের সদস্যপদ বাতিল করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যুব সম্প্রদায়কে নির্বাচনী রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাদের ভোটাধিকার অর্জনের বয়স ২১থেকে কমিয়ে ১৮ করা হয়েছে ৬১তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে।

সত্তরের দশক থেকে ভারতের রাজনীতিতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের যে প্রয়াস চলছিল তাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে আশির দশকে। এই সময় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীভবনের পক্ষে জনমত গড়ে উঠতে থাকে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের সংযুক্ত হওয়ার প্রবণতা বাড়তে থাকে। সেই প্রবণতাকে বাস্তবায়িত করতে ৭৩তম ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধন করা হয় যা গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলের জন্য যথাক্রমে পঞ্চায়েত ও নগরপালিকা গঠন বাধ্যতামূলক করে দেয়। ১১ ও ১২ নম্বর তফশিলে এই দুই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের কাজ উল্লেখ করে এই দুটি সংবিধান সংশোধন ভারতের নাগরিকদের স্থানীয় স্তরে সরকারি কাজ-কর্ম করা তথা স্থানীয় সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

সংবিধান সংশোধনের আর্থ-সামাজিক প্রভাব: স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে ভারতের জাতি গঠন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় বাধা ছিল ভারতের দারিদ্র লাঞ্ছিত অর্থনীতি। এই সময় ভারতের কৃষি-প্রধান অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজন ছিল ভূমি-সংস্কার। জমির মালিক ও কৃষিশ্রমিকদের মধ্যে দূরত্ব কমানোর লক্ষ্যে সরকার সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে জমিদারি প্রথা লোপ করার উদ্যোগ নেয়। জমিদারি প্রথা বিলুপ্তি আইন প্রণয়ন করে সরকার সংবিধানের প্রস্তাবনাতে উল্লিখিত 'ন্যায় বিচার' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের

প্রচেষ্টা করে। ভূমি-সংস্কার করার জন্য আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা করলে ১৯(১)(চ) ধারা ও ৩১(১-৬) ধারা অনুসারে মামলা করে সরকারের সেই উদ্যোগ প্রতিরোধ করা হয়। বিচার বিভাগ এই প্রতিরোধে সহায়তা করে। ফলে, বিচারবিভাগ ও সংসদের মধ্যে বিরোধ বাধে। সরকার সংবিধান সংশোধনকে হাতিয়ার করে এই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করতে থাকে।

প্রথম সংশোধনের মাধ্যমে এই রকম একটি প্রয়াস নেওয়া হয়; ১৯৫০ সালে মাদ্রাজ সরকার সামাজিক বিপ্লবের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে সমাজের অনগ্রসর মানুষদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে শ্রীমতি চম্পকম ডোরাইরাজন[২২] মাদ্রাজ রাজ্যের বিরুদ্ধে মামলা করেন মাদ্রাজ হাইকোর্টে। প্রথমে মাদ্রাজ হাইকোর্ট ও পরে সুপ্রিম কোর্টে সরকারের প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই, প্রথম সংবিধান সংশোধনেই ১৫(৪) নং ধারা সংযোজন করে সরকার অনগ্রসর মানুষদের জন্য সরকারি প্রচেষ্টাকে সুরক্ষিত করে। একই সাথে ৩১ক, ৩১খ ও নবম তফসিল সংবিধানে সংযোজন করে ভূমিসংস্কারের উদ্দেশ্যে ভূ-সম্পত্তি অধিগ্রহণকে বৈধকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে; অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সংসদকে ক্ষমতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় ৪র্থ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে। ২৫তম সংবিধান সংশোধন এই প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর করে তোলে। তবে এক্ষেত্রে সবথেকে জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া হয় ৪৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে। এই সংবিধান সংশোধন সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অধ্যায়[২৩] থেকে বাদ দিয়ে তাকে আইনগত অধিকার রূপে ৩০০ক ধারাতে রাখা হয়।

ভারতীয় সমাজে সামাজিক অসাম্য দূর করার উদ্দেশ্যে ২৬তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভারতীয় রাজন্যবর্গের রাজন্যভাতা বিলুপ্ত করা হয়েছে। ভারতীয় সমাজে তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের উন্নয়ন সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে গণ্য হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ভারতের সংবিধানের ৩৩০, ৩৩২-৩৩৪ ধারা সময় সময় ৮,২৩,৪৫,৬২,৭৯,৯৫ নং সংশোধন মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভায়, তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতির আসন সংরক্ষণের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। ৬৫তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতিদের জন্য জাতীয় কমিশন গঠন করা হয়; রাষ্ট্রপতি এই পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠন করে দেন। ১৯৯৪ সালে ৭৬তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সরকারি চাকরি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আসনের ৬৯% সংরক্ষণ করা হয়েছে তামিলনাড়ুতে। ৭৭তম সংবিধান সংশোধন তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতিদের চাকরির পদোন্নতির ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। ২০০০ সালে ৮২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পরীক্ষায় তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতিদের সাফল্য নিশ্চিত করতে যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় নম্বর ছাড় ও মূল্যায়নের স্তরের অবমূল্যায়নের ব্যবস্থা করেছে। এর পাশাপাশি শিক্ষার অধিকার

দীর্ঘদিন মৌলিক অধিকার হিসাবে গণ্য না হলেও ২০০২ সালে ৮৬তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষাকে ২১ক ধারাতে লিপিবদ্ধ করে একটি মৌলিক অধিকার রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ৪৫নং ধারা সংশোধন করে রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে এবং ৫১ক ধারা সংশোধন করে সন্তানকে শিক্ষা প্রদানের কর্তব্য আরোপ করা হয়েছে পিতামাতার উপরে। এভাবেই বছরের পর বছর ভারতের সংবিধান সংশোধন করার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

সংবিধানের কার্যপদ্ধতির সমীক্ষা: ভারতের সংবিধান ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিভিন্ন প্রতিকূলতার প্রতিরোধে সহায়তা করেছে বিগত ৬৫ বছরে, তার মধ্যে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ পর্যন্ত রয়েছে। ভারতের প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্য নিশ্চিত করেছে এই সংবিধান। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, জাতপ্রথা, অন্তঃসারশূন্য ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদির জন্য ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই বলা হয় যে ভারতের সংবিধানের কার্যকারিতা ভারসাম্যযুক্ত হয়নি; কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংবিধান সাফল্য লাভ করলেও, কতগুলি ক্ষেত্রে সংবিধান ভারতের সংবিধান প্রণেতাদের স্বপ্ন সফল করতে পারে নি। সেই কারণেই ভারতের সংবিধানের কাজকর্মের সমীক্ষা করা নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভেঙ্কটচালাইয়া-এর সভাপতিত্বে ১১ সদস্যের National Commission to Review the working of the Constitution গঠন করা হয়। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি জীবন রেড্ডি, বিচাপতি আর.এস. সারকারিয়া, বিচারপতি কোট্টাপল্লি পুন্নইয়া, বিচারপতি সোলি সোরাবজি, বিচারপতি পি. পারাসারান, বিচারপতি পি.এ. সাংমা, বিচারপতি সুভাষ কাশ্যপ, বিচারপতি সি আর ইরানি, বিচারপতি আবিদ হোসেন, বিচারপতি সুমিত্রা কুলকার্নি। ২০০০ সালের জুন মাস থেকে কাজ শুরু করেও ২০০২ সালের মার্চ মাসে এই কমিশন তার প্রতিবেদন পেশ করে। ১৯৭৬ পাতার প্রতিবেদনে ২৪৯ টি সুপারিশ করে কমিশন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুপারিশ[২৪] নিয়ে আলোচনা করা হল।

(১) ৩৫৬নং ধারার অপব্যবহার প্রতিরোধ করার কথা বলে কমিশন। কমিশন বলে যে ৩৫৬নং ধারার প্রয়োগ অন্য উপায় না থাকলে তবেই করা উচিত। এই ধারা প্রয়োগ করে কোনো রাজ্যের আইনসভা ভেঙে দেওয়ার আগে লোকসভা ও রাজ্যসভার দ্বারা তা অনুমোদিত হতে হবে। কমিশন আরও বলে রাজ্যপালের যে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ৩৫৬ প্রয়োগ করা হবে তা গণমাধ্যমে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করতে হবে।

(২) কমিশন রাজ্যপালের নিয়োগ, কাজকর্ম ও ক্ষমতার বিষয়ে বিভিন্ন সুপারিশ

করে। কমিশন সংবিধানের ১৫৫, ১৫৬, ২০০ ও ২০১ ধারার সংশোধন করার মাধ্যমে রাজ্যপালের পদটিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে বলে। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, লোকসভার স্পীকার, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, ও সম্ভব হলে উপরাষ্ট্রপতিকে নিয়ে গঠিত একটি সংস্থার দ্বারা রাজ্যপালকে নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছে। রাজ্যপালের পদচ্যুতি রাষ্ট্রপতির উপরে নির্ভরশীল না রেখে রাজ্য আইনসভার উপরে ন্যস্ত করার সুপারিশ করেছে কমিশন।

(৩) সরকার গঠনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে কমিশন প্রস্তাব দেয় যে, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল যেভাবে নির্বাচন পরবর্তীকালে সর্ববৃহৎ দলের নেতাকে সরকার গঠন করার জন্য ডাকেন তার পরিবর্তে লোকসভা বা রাজ্য আইনসভা নির্বাচন পরবর্তী একটি অধিবেশনে মিলিত হয়ে তাদের নেতাদের নির্বাচিত করতে পারেন, এবং নির্বাচিত নেতাদের নিয়ে সরকার গঠন করতে পারেন।

(৪) কমিশন স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যাতে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানের উপরে প্রাধান্য করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন, কাজের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা, গ্রামসভা, আমলাতন্ত্রের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলি সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

৫) কমিশন মৌলিক অধিকার সমূহের সম্প্রসারণ ঘটানোর সুপারিশ করেছে। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, তথ্যের স্বাধীনতা, অমানবিক শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধ করা, বিদেশে গমনাগমনের অধিকার, গোপনীয়তার অধিকার ইত্যাদিকে কমিশন মৌলিক অধিকার রূপে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব করেছে।

(৬) জাতীয় বিচারবিভাগীয় কমিশন গঠন করে তার মাধ্যমে বিচারপতিদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, অবসরগ্রহণ, দায়িত্বশীলতা, বিচারপতিদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, পদচ্যুতির মত বিষয়গুলি নির্ধারণ করার সুপারিশ করেছে কমিশন। রাষ্ট্রপতির পক্ষে বিচারবিভাগীয় কমিশনের সুপারিশগুলি গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হবে। বিচারবিভাগকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখার জন্য এই সুপারিশ করে সমীক্ষা কমিশন।

এছাড়াও কমিশন যে সুপারিশগুলি করে তার মধ্যে রয়েছে- কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালত ফৌজদারী চার্জ গঠন করলে, তাকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না দেওয়া। দলত্যাগ বিরোধী আইন সংশোধন করে রাজনৈতিক দলের ভাঙন প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা। নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ একটি বিশেষ সংস্থার মাধ্যমে করা। লোকপাল প্রতিষ্ঠা করা ও প্রধানমন্ত্রীকে তার এক্তিয়ারের বাইরে রাখা। ১৯৮৮ সালের 'দুর্নীতি নিরোধ আইন' সংশোধন করা।

সংবিধান সমীক্ষা কমিশনের সমস্ত সুপারিশ গ্রহণ করা হবে এমন আশা করা না গেলেও, এর প্রতিবেদনের প্রতি ভারত সরকারের ইতিবাচক মনোভাবের একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হল ২০১৫ সালের ১৩ই এপ্রিল ৯৯তম সংবিধান সংশোধন আইনের মাধ্যমে 'বিচারবিভাগীয় নিয়োগ কমিশন' গঠন। বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ দূর করার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ আরো একবার ভারত রাষ্ট্রের প্রগতির ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের প্রাসঙ্গিকতাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। সংবিধান সংশোধন ছাড়া যে জাতির প্রগতি সম্ভব নয় তা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। তবে বিগত ৬৫ বছরে ভারতের সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিচারবিভাগ বনাম আইন বিভাগ তথা শাসন বিভাগের বিবাদ যে শিক্ষা দিয়েছে তা হল, নাগরিক স্বার্থ রক্ষার জন্যই সংবিধান সংশোধন হওয়া প্রয়োজন, সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে সংবিধান সংশোধন জাতির পক্ষে ক্ষতিকারক। সেই জন্য জাতির স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর প্রতি সরকারের তিনটি বিভাগের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহেতেই সংবিধান সংশোধন করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

তথ্যসূত্র ঃ নির্দেশিকা

1. A.V. Dicey: Introduction to the Study of the Law of the Constitution London, 1952, P. 127
2. C.A.D., Vol.-VII, 4 November, 1984, PP 43-44
3. K. C. Wheare: Modern Constitutions, London, 1951, p 143
4. Introduction to the Constitution of India, Brij Kishore Sharma, New Delhi, chapter 28, p 361
5. The Constituion of India, New Delhi 1999, Part XX, p 163
6. মোট সদস্য গণনার ক্ষেত্রে লোকসভার অনুশাসনের ১৫৯ বিধান অনুসারে শূন্যপদ ও অনুপস্থিত সদস্যদের গণনা করা হয় না।
7. Introduction to the Constitution of India, Brij Kishore Sharma, New Delhi, Chapter 28, p 362.
8. Shankari Prasad v. Union of India, A.I.R. 1951 S.C 458
9. Sajjan Singh v State of Rajasthan, A.I.R. 1965 S.C 845
10. I.C. Golaknath v State of Punjab, A.I.R. 1967 S.C. 1643
11. ২৬নং সংবিধান সংশোধন এর মাধ্যমে ২৯১ নং ধারা বিলুপ্ত করে 'রাজন্যভাতা' এর বিলোপ ঘটানো হয়। ২৭নং ধারার মাধ্যমে মিজোরামকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়।
12. Kesavananda Bharati v State of Kerala, A.I.R. 1973 S.C. 1461

13. Ibid f. n. 3
14. সংবিধানে এই সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা না থাকলেও এর উৎপত্তি ঘটে সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা থেকে এবং যা সংসদ কোনো ভাবেই পরিবর্তন করতে পারে না।
15. কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরল রাজ্য মামলার রায়ে সংবিধানের 'মৌলিক কাঠামো' এই ধারণাটি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেনি সুপ্রিম কোর্ট, তবে প্রধান বিচারপতি সিক্রি 'মৌলিক কাঠামো' বলতে বুঝিয়ে ছিলেন (১) সংবিধানের সার্বভৌমত্ব, (২) সরকারের সাধারণতান্ত্রিক রূপ ও গণতান্ত্রিক রূপ (৩) সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র, (৪) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ, (৫) সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্রকে। একই মামলায় বিচারপতি হেগড়ে ও বিচারপতি মুখার্জী 'মৌলিক কাঠামো' বলতে বুঝিয়েছিলেন 'ভারতের ঐক্য', 'রাজনৈতিক ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক চরিত্র' ও 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে'। বিচারপতি খান্না ভারতের 'গণতান্ত্রিক সরকার' এবং এবং 'রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে' সংবিধানের মৌলিক কাঠামো হিসাবে গণ্য করেন।
16. ৩১-গ রাজ্য বিধানসভাগুলিকে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা থেকে সুরক্ষিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে প্রকারন্তরে তাদের হাতেও সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল।
17. Minarvga Mills v Union of India, A.I.R. 1980 S.C. 1789
18. Waman Rao v Union of India, A.I.R. 1981 S.C. 271
19. সংবিধানের ৩১-খ উপধারার মাধ্যমে কিছু আইনকে বৈধতা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই উপধারাতে বলা হয়েছে যে, মৌলিক অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও, সংবিধানের নবম তফসিলে উল্লিখিত আইন আদালত বাতিল করতে পারবে না, উপযুক্ত আইনসভাই একমাত্র ঐ আইনে পরিবর্তন আনতে পারবে।
20. I. R. Coelho (dead) by L. Rs. v State of Tamilnadu, J.T. 207 (2) S. C 292
21. Shrimati Champakam Dorairajan v State of Madras A.R.I. 1951 S.C. 227j.
22. The Constitution of India, New Delhi 1999 Chapter - III
23. Essays on Indian Government and Politics: A continuing Review, edit by Meera Verma, Mrinal Mehta, Rumki Basu, ch 10, p. 200.